International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-V, September 2023, Page No.18-24
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i5.2023.18-24

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের নিরিখে ‘পাঠক গ্রাহ্যতা’ (Reception Theory) ও ‘পাঠক-প্রতিক্রিয়া’-র (Reader-response Theory) প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা

ড. পরিমল চন্দ্র দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়, বাগডোগরা, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract :

According to Tagore, the main goal of any author is the reader community or the taster of literature. The satisfaction of the reader is an absolute desire for any author. It is in the context of this theoretical discussion of literature that 'Reception Theory' or 'Reader-response Theory' is involved with literaure. As a reader doesn't just read, he or she will also want to interpret it in his own way, likewise any author expects a natural response from a reader. In fact 'Reader-response Theory' developed from the perspective of the 'Formalistic Approach'. Until the second decade of the 20th century, the literary criticism was mainly dominated by 'Formalistic Approach'. From Plato to Aristotle, almost all critics have been talking about the importance of 'Form' for so long. But, the proponents of the 'Reader-response Theory' think that the readers have become secondary in the criticism until now, while the reader should be the main one in the response to the text. Then after the invention of this 'Reader-response Theory' by Hans Robert Jauss, it gained wide publicity and expansion in the world of criticism. But, in our view, just as the value of literary creation cannot be determined by 'Formalistic Approach', the 'Reader-response Theory' also has many limitations. In the discussion article, an attempt has been made to point out the limitations of both 'Formalistic' and 'Reader-response Theory' by extracting examples from Bengali literature keeping Tagore's literary theory in front.

Key words: Tagore's literary Theory, Formalistic Approach, Reception Theory, Reader-response Theory, Variation of texts, Eligibility of the reader.

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘উপনিষদ্’ ব্রহ্মস্বরূপের যেমন তিনটি ভাগ করেছেন –অর্থাৎ ‘সত্যম’, ‘জ্ঞানম্’ এবং ‘অনন্তম্’; তেমনি ‘মানবাত্মার’ও তিনটি ভাগ রয়েছে। এই তিনটি ভাগ হ’ল – ‘আমরা আছি’, ‘আমরা জানি’ এবং ‘আমরা ব্যক্ত বা প্রকাশ করি। ইংরেজিতে বলতে গেলে বলা যায় – I am, I know, I express. সত্যের এই তিন ভাব আমাদের নানা কাজে ও নানা প্রবর্তনায় নিয়ত উদ্যত করে। টিঁকতে হবে তাই অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাসস্থান চাই, স্বাস্থ্য চাই। ‘আমি আছি’ সত্যের এই ভাবটি যেমন আমাদের নানা কাজ করায়, তেমনি ‘আমি আছি’ বলেই বিশ্বজাগতিক উপাদানগুলিও আপন আপন অস্তিত্বকে সার্থকতায় উন্মুখ ক’রে

তোলে। কবির ভাষাতেই বলা যায়, 'আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যাতারা ওঠা, মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল ফোটা।'আমি আছি'-এই বিষয়টির সঙ্গে রয়েছে 'আমি জানি'। জ্ঞানের রাজ্যে মানুষের জানবার আয়োজন অত্যন্ত বিপুল এবং তার মূল্যও মানুষের কাছে খুব বড়ো।কিন্তু, 'আমি আছি' এবং 'আমাকে টিঁকে থাকতে হবে' কথাটি যখন সংকীর্ণ সীমায় আটকে থাকে, তখন শুধু 'আত্মরক্ষা' বা 'বংশরক্ষা' আমাদের 'অহং'কে আঁকড়ে থাকে।শুধু 'আমি আছি' বা 'আমাকে টিঁকে থাকতে হবে' –এই ভাবনার মধ্যে 'আনন্দস্বরূপের' যেমন কোনো স্থান নেই, তেমনি মানব সমাজে শুধু এই টিঁকে থাকা বিশেষ কোনো তাৎপর্যও বহন করে না।'রক্তকরবী'-র সেই 'মরা ব্যাঙের' কথা নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে।কোনো এক কালে পাথরের কোটরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তারপর কোনো রকম প্রাণপ্রবর্তনা ছাড়াই সে তিন হাজার বছর ধরে শুধু টিঁকে ছিল। 'আমি আছি' এবং 'আমি জানি' মানবাত্মার এই দুটি বিভাগ আবার একে অন্যের সঙ্গেও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।কেননা – 'টিঁকে' থাকতে হলে টিঁকে থাকার কৌশল জানতে হবে অর্থাৎ জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু, একথাও ঠিক যে, শুধু টিঁকে থাকার জন্য মানুষ যে জ্ঞান আহরণ করে থাকে, সেই জ্ঞানের কোনো দীপ্তি থাকে না। জ্ঞানের রাজ্যে যদি অসীমের প্রেরণা না থাকে, তাহলে সেই জ্ঞান দীপ্তিহীন।'আমি আছি' এবং 'আমি জানি' এই দুটি বিষয় ছাড়াও মানবসত্যের তৃতীয় যে দিকটি রয়েছে, সেটি হ'ল 'আমি প্রকাশ করি'। 'আমি আছি' এবং 'অন্য সকলেও আছে' – এই যে অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মাহাত্ম্য ঘটে সেইটেই হচ্ছে আত্মার ঐশ্বর্য।সেই মিলনের প্রেরণাতেই মানুষ নিজেকে নানা প্রকারে 'প্রকাশ' করতে থাকে। যেখানে মানুষের জ্ঞান সর্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে মানবাত্মার সর্বত্র প্রবেশের অধিকার ঘোষণা করে, জ্ঞানের সেই অসীম জগৎ তখন বিজ্ঞানে, দর্শনে বিস্তৃত হতে থাকে।আর জ্ঞানের রাজ্যে বিশুদ্ধ আনন্দরসের যে ধারাটি উৎসারিত হয়, সেইটেই নানা রচনায় – সাহিত্যে ও আর্টে প্রকাশ পায়।

সাহিত্যতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে 'সাহিত্য' কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন – "সাহিত্য শব্দটার কোনো ধাতুগত অর্থব্যাখ্যা কোনো অলংকারশাস্ত্রে আছে কি না জানি না ... কিন্তু আমি যাকে সাহিত্য বলে থাকি তার সঙ্গে ঐ শব্দটার অর্থের মিল করে যদি দেখাই তবে তাতে বোধ করি দোষ হবে না ... সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য অর্থাৎ সম্মিলন। মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলবার জন্যে, অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশে।" [১] প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ খুব সুন্দরভাবে সাহিত্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, মানুষ তার ভালো লাগা, মন্দ লাগা, রাগ-ক্ষোভ-অভিমান যথাস্থানে প্রকাশ না করে থাকতে পারে না। মানুষ যখন তার খুশি, দুঃখ, রাগ, ভালোবাসাকে শুধু প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকল না, তাকে প্রকাশের উৎকর্ষ দিতে লাগল; তখন সেখানে সংযোজিত হ'ল সুর, তাল, লয়, ছন্দ, অলংকার।এভাবেই মানুষ তার আপন ভালো মন্দ লাগার জগৎকে অন্তরঙ্গভাবে সকল মানুষের সাহিত্যের জগৎ করে নিল।

'সাহিত্য' 'একাকী গায়কের গান' নয়। যে মানুষ শুধু নিজের আনন্দের জন্যই সাহিত্য রচনা করে, তার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক একজন কৃষকের সঙ্গে সব্‌জি খেতের সম্পর্কের মতো। সব্‌জি-খেতের শেষ উদ্দেশ্য খেতের বাইরে, সে হচ্ছে ভোজ্য-সংগ্রহ। কিন্তু, ফুলের বাগানের সঙ্গে একজন কৃষকের সম্পর্ক ভিন্ন। অর্থাৎ মানুষের মন সেই ফুলের বাগানের সঙ্গে মিলতে চায়- সেখানে গিয়ে সে বসে, বেড়ায়। কিন্তু, পুষ্প যেমন শুধু 'আপনার জন্যে ফোটে না', তেমনি কবি সৃষ্ট ফুলের বাগানের সৌন্দর্যে ভ্রমরকে মোহিত করে তুলতে হবে, সেখানে উড়ে বেড়াবে নানা রঙের প্রজাপতিও। কবির সাহিত্যরূপ ফুলের বাগানে যদি উপযুক্ত রূপ-

রস-গন্ধ-লাবণ্য-মাধুর্য্য থাকে, তবেই সেখানে মধুকর-ভ্রমরের আনাগোনা লেগে থাকবে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, লেখকের লক্ষ্য পাঠক-সমাজ বা সাহিত্যের আস্বাদক।আস্বাদকের পরিতৃপ্তি যেকোনো সাহিত্য রচয়িতার কাছে এক পরম কাঙ্ক্ষিত বিষয়। সাহিত্যের এই তাত্ত্বিক আলোচনা প্রসঙ্গেই সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে 'পাঠক গ্রাহ্যতার তত্ত্ব' বা 'Reception Theory' তথা 'পাঠক-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব' বা 'Reader-response Theory'. প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, 'Reception' এবং 'Response' শব্দদুটির অর্থ পৃথক। প্রথমটিতে আমরা বুঝি 'গ্রাহ্যতা' আর দ্বিতীয় শব্দটির অর্থ 'প্রতিক্রিয়া'। কিন্তু পাঠক যেমন শুধু একটি টেক্সট্ পাঠ বা গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেন না, তিনি তার নিজের মতো করে সেটি ব্যাখ্যাও করতে চাইবেন; তেমনি যেকোনো লেখক একজন পাঠকের থেকে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াও প্রত্যাশা করেন। মজার ব্যাপার হ'ল যাঁরা 'গ্রাহ্যতা' বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁদের আলোচনাতেই বারবার উঠে এসেছে পাঠকের 'প্রতিক্রিয়া'-র কথা।সঙ্গত কারণেই একসময় যাকে 'Reception Theory' বলা হয়েছিল, সেটি-ই পরবর্তীকালে ' Reader-response Theory' নামে পরিচিত হয়েছে।

'Reception Theory' বা 'Reader-response Theory'-টিকে প্রথম সুস্পষ্টরূপে সমালোচনা সাহিত্যের জগতে তুলে ধরেন হ্যান্স রবার্ট জাউস (Hans Robert Jauss)। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন বলে জানা যায়। অবশ্য জাউস কর্তৃক এই তত্ত্ব পাঠকের সামনে আসবার পূর্বেই, বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে এ ধরনের একটি তত্ত্বের কথা বিভিন্ন সমালোচকের আলোচনায় বারবার উঠে এসেছিল। আই এ রিচার্ডস, বি ডব্লু হার্ডিং বা লুইস রোজেনব্লাট প্রমুখ সুবিখ্যাত তাত্ত্বিক-আলোচকেরা সাহিত্যের আখ্যানে চরিত্রের ভূমিকায় পাঠকের 'মানসিক' অভিনয়ের কথা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। অতঃপর বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদীদের গুরুত্ব বেড়ে গেল। অবশেষে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে Hans Robert Jauss পাঠক-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বটিকে পাঠক-সমালোচকদের সম্মুখে তুলে ধরেন। 'Reader-response Theory'-র মূল কথাটি হ'ল - 'Reception theory is a version of reader response literary theory that emphasizes each particular reader's reception or interpretation in making meaning from a literary text. Rexeption theory is generally referred to as audience reception in the analysis of communications models." [২] বিগত শতাব্দীর ছয়ের দশকে হ্যান্স রবার্ট জাউস তাঁর 'টুওয়ার্ড অ্যান অ্যাসথেটিক অফ রিসেপশনে'- নামক রচনায় জানিয়েছেন যে, "Theory of Reception" বলতে পাঠক প্রতিক্রিয়া তত্ত্বের একটি ঐতিহাসিক প্রয়োগকে বোঝায়। এই তত্ত্বানুযায়ী প্রজন্ম ব্যবধানে পাঠকেরা কোনো একটি টেক্সট্ পাঠ করে তার ব্যাখ্যামূলক এবং মূল্যায়নমূলক প্রতিক্রিয়াগুলি পরিবর্তন করার উপর জোর দিয়ে থাকেন। এটি ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাধারণ পাঠকের পক্ষ থেকে আলোচনা এবং বিরোধিতার সুযোগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কারণ তারা তাদের নিজ নিজ সাংস্কৃতিক পটভূমি এবং জীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই একটি টেক্সট্-এর অর্থ ব্যাখ্যা করে থাকেন। যেহেতু পাঠকের ভাষাগত এবং নান্দনিক প্রত্যাশা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়, এবং যেহেতু পরবর্তীকালে পাঠক এবং সমালোচকদের পাশাপাশি এর সমালোচনারও সুযোগ রয়েছে, তাই একটি প্রদত্ত সাহিত্যকর্মের ব্যাখ্যা এবং মূল্যায়নের একটি বিকশিত ঐতিহাসিক ঐতিহ্য কালক্রমে গড়ে ওঠে। জাউস এই ঐতিহ্যকে টেক্সট্ এবং ধারাবাহিক পাঠকের দিগন্তের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন দ্বান্দ্বিকতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তাঁর নিজের মতে, সাহিত্যের টেক্সট্ নিজে কোন অন্তর্নিহিত অর্থ বা মূল্য ধারণ করে না। প্রকৃতপক্ষে Hans Robert Jauss পাঠক-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বকে কিছুটা ইতিহাসের সীমায়

বাঁধতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, সাহিত্যের ব্যাখ্যা অনেক সময় যেমন ইতিহাস চেতনাকে গৌণ করে দেয়, অন্যদিকে তেমনি সমকালীন চিন্তা-ভাবনাও মূল রচনার বিষয়বস্তুকে গৌণ করে দেয়। Hans Robert Jauss তাঁর পাঠক-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বে এই দুটি প্রবণতার মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, পাঠক-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বটি গড়ে উঠেছে 'গঠনমূলক সমালোচনা' বা Formalistic Approach - এর বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পূর্ব পর্যন্ত সমালোচনার জগতে প্রধানত 'গঠনবাদী সমালোচনা'-র ধারাটিই মুখ্য ছিল। প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে প্রায় সব সমালোচকেরাই এত কাল ধরে কোনো না কোনোভাবে শিল্প-সাহিত্যের রূপ বা অবয়বের গুরুত্বের কথা বলে আসছিলেন।শিল্প-সাহিত্যের সমগ্র রূপের সঙ্গে তার বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তার কথা উনিশ শতকের রোম্যান্টিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বড় বড় লেখক ও শক্তিমান কবিরাও মেনে নিয়েছিলেন। বস্তুত, গঠনবাদী সমালোচনায় সাহিত্যের মূল পাঠ-কেই এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয় যার সঙ্গে স্রষ্টা,পাঠক বা শিল্পকর্মে বর্ণিত ঐতিহাসিক কাল বা যে সময়ে শিল্পকর্মটি রচিত - কোনো কিছুর সঙ্গেই আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু, পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদীরা মনে করে থাকেন যে, সমালোচনার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত পাঠকরাই গৌণ হয়ে গেছেন, অথচ পাঠের প্রতিক্রিয়ায় পাঠকেরই প্রধান হবার কথা। এ বিষয়ে সমালোচক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার মহাশয় জানিয়েছেন - ' পাঠকই তো টেক্স্ট পড়ে নিজের মতো করে টেক্স্ট তৈরি করেন। মূল পাঠের যা কিছু অর্থ তা তো পাঠকেরাই ব্যাখ্যা করে বুঝবেন। কাজেই পাঠ ও তার ব্যাখ্যায় পাঠককে গৌণ করে গঠনবাদীরা নিজেদেরই সংকীর্ণমনা গোঁড়া ও বিভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছেন।'' [৩]

কিন্তু, সমস্যা হ'ল পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদীরা তাঁদের শিল্প-বিচারে একটু অপরিণত পাঠককেও যেমন তাঁদের বিচার-উপভোগে সহযোগী করতে চান, তেমনি, মনস্তাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক কিংবা দার্শনিকদেরও সহযোগী হিসেবে পেতে চান। বস্তুতপক্ষে, শিল্প -সাহিত্য-সৃষ্টির যেমন বিষয়বস্তুগত বা রূপ-রীতিগত রকমফের বা ভিন্নতা রয়েছে, তেমনি পাঠকদের মধ্যেও রয়েছে নানা শ্রেণি-বিভাজন। সমস্ত সৃষ্টি যেকোনো একটি শ্রেণির পাঠকের উপযুক্ত হ'তে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পরিণত মনের পাঠকেরা 'শিশু সাহিত্য' পাঠ করে রস আস্বাদন করতেই পারেন, সমালোচনা করতেই পারেন; কিন্তু, মনে রাখতে হবে যে, শিশু সাহিত্যের প্রধান পাঠক শিশুরাই। এই শ্রেণির সাহিত্য যদি শিশুদের কাছে উপভোগ্য বলে মনে না হয়, তাহলে শিশু সাহিত্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হয়ে যায়। শিশু সাহিত্যের কোনো একটি অংশ পরিণত মনের পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হতেই পারে - যে অংশটি হয়তো বা শিশুদের কাছে খুব একটা উপভোগ্য বিষয় নয়। আবার শিশুদের কাছে যা যা পরম আকর্ষণীয় বিষয়, সেগুলি একজন পরিণত মনের পাঠকের কাছে উল্লেখযোগ্য বিষয় বলে মনে নাও হতে পারে। তাছাড়া, একজন পরিণত মনের পাঠক যখন শিশু সাহিত্য পাঠ করে তার ব্যাখ্যা করতে যান, তখন তাঁর সেই ব্যাখ্যাটি কিন্তু আর শিশু-মনের উপযোগী থাকে না। সমস্ত ধরনের সাহিত্য বা শিল্পকলা সমস্ত ধরনের পাঠকের পাঠের উপযোগী হতে পারে না। পৃথিবীতে এমন শিল্পসৃষ্টি খুব কমই আছে, যা সর্বসাধারণের পাঠের সামগ্রী। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় 'শ্রীরামপুর মিশন' থেকে রামায়ণের অনুবাদ 'শ্রীরাম পাঁচালী' প্রকাশিত হলে পরে, গ্রন্থটি বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। লক্ষণীয়, এখনও যে আগ্রহ নিয়ে মহাপণ্ডিতগণ 'রামায়ণ' পাঠ করে থাকেন, সমান আগ্রহ নিয়ে মুদিখানার মালিকও মাটির প্রদীপের মিট্‌মিটে আলোতে সেই 'রামায়ণ' পাঠ করে থাকেন। এমন দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখা পাওয়া কি সম্ভব!

অপরিণত পাঠকের দ্বারা কোনো একটি পরিণত মনের রচনার পাঠক-প্রতিক্রিয়া কতোটা যথাযথ হতে পারে, তার একটি চমৎকার উদাহরণ রয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথের মতো মহান কবি-সাহিত্যিকেরা খুব অল্প বয়সেই 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর পাঠ-গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলে আমরা সকলেই জানি। কিন্তু, একেবারে তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সমালোচনা লিখতে গেলেন, তখন তাঁর মূল্যায়ন ভুল হ'ল। এই জন্য পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথকে আক্ষেপও করতে হয়েছিল। এ ধরনের ঘটনা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক, উপন্যাসকে নিয়েও ঘটেছে। সমকালে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, উপন্যাসের পাঠক-প্রতিক্রিয়ায় যা ঘটেছে তা আরও মারাত্মক। এক ধরনের পাঠক-সমালোচক রয়েছেন, যাঁরা অবশ্যই পরিণত মনের পাঠক; কিন্তু কোনো কারণে লেখকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'লে তাঁর রচনাটিকে একেবারে শুরু থেকেই নেগেটিভ দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ করেন বা সমালোচনা করেন। সমকালে 'সোনারতরী' কবিতার বিরূপ সমালোচনায় একপ্রকার বিরক্ত হয়েই রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত কবিতাটির রূপক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস পাঠ করে জনৈক লেখিকা পত্র লিখে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছিলেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ একপ্রকার বাধ্য হয়েই পত্র-লেখিকাকে জবাব দিতে গিয়ে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছিলেন। সচরাচর লেখকেরা নিজের রচনার বিষয়বস্তু নিজে ব্যাখ্যা করতে চান না। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথকে বহুবার এ কাজ করতে হয়েছে।

শুধু অপরিণত পাঠকেরাই নয়, অনেক সময় পরিণত মনের পাঠক-সমালোচকেরাও কোনো সাহিত্য-কর্মের ভুল মূল্যায়ন করে থাকেন। ঔপন্যাসিক মানিক বন্দোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' একটি বহুপরিচিত এবং বহুচর্চিত উপন্যাস। উপন্যাসটি বহুকাল যাবৎ একটি 'আঞ্চলিক উপন্যাস' হিসেবে সমালোচক মহলে পরিচিত ছিল। অবশেষে বিদগ্ধ সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার মহাশয় তাঁর 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থে সমালোচকদের একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির 'ফ্রেম'-টা 'আঞ্চলিক' হলেও উপন্যাসটি 'আঞ্চলিক' নয়। কিন্তু, এককালে অনেক পাঠক-সমালোচকেরা বুঝতেই পারেন নি যে, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বস্তুসমগ্রতা বর্ণনা করা 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের লক্ষ্য নয়। বরং চলমান নদীস্রোতের পটভূমিতে জেলেগ্রাম কেতুপুরের এক প্রান্তে মানুষের প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের কথাই 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে।

পাঠকেরা অনেক সময় বিশেষ বিশেষ শ্রেণি হিসেবে, বিশেষ বিশেষ আদর্শের অনুসারী হয়েও কোনো রচনার মূল্যায়ন করে থাকেন। এই ধরনের প্রতিক্রিয়া সব ক্ষেত্রে যথাযথ নাও হতে পারে। এক শ্রেণির পাঠকেরা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটিকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উৎস বলে মনে করে থাকেন। এ বিষয়ে সমালোচক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার মহাশয় জানিয়েছেন,- 'ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্বে ইংরেজ এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ যে ব্রিটিশ-বিরোধী চেতনারই ছদ্মবেশ হিসেবে দেখানো হয়েছে, ইংরেজদের কর্মচারী হিসেবে বঙ্কিমকেও যে 'ইংরেজ' শব্দটি কেটে মাঝে মধ্যে অপর শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই যুদ্ধের বর্ণনাকে রাখতে হয়েছে, হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ ছড়াবার জন্যে 'আনন্দমঠ'কে অস্ত্র হিসেবে তুলে ধরেননি তিনি, এটা আমরা আজও বুঝতে চাই না'। [৪] রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের বিষয়বস্তুও সমকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লববাদী বা ওই পথের সমর্থকদের একেবারেই পছন্দ হয়নি। ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাস সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।

'জাগরী' উপন্যাসে একটি রাষ্ট্রীয় পরিবারের ছোট ছেলে নীলু কম্যুনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী। নীলু তার দাদা বিলুকে ধরিয়ে দিয়েছে বলেই ফাঁসির আসামী বিলু মৃত্যুর পূর্বে আত্ম-বিশ্লেষণে মগ্ন হয়ে পড়েছে। কম্যুনিস্ট নীলুকে দিয়ে এ ধরনের কাজ করানো কম্যুনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী পাঠকেরা মেনে নিতে পারেন নি।

কিছু গ্রন্থ অবশ্যই সব শ্রেণির পাঠকের জন্য নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাগীতি' লেখা হয়েছিল বিশেষ এক শ্রেণির পাঠকদের (বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকেরা লিখেছেন তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের জন্য) উদ্দেশে। সাধারণ পাঠক যারা বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের 'সাধনতত্ত্ব'-র সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের পক্ষে 'চর্যাগীতি'-র মর্ম বোঝা কঠিন। 'নাথসাহিত্য' সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা প্রযোজ্য। একসময় গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট করতে আসা ছাত্ররা ক্লাসের মাস্টার মশাইদের কাছে অভিযোগ করতেন,- সুকুমার সেন মহাশয়ের লেখা সাহিত্যের ইতিহাস বা ভাষাতত্ত্বের বই সহজপাঠ্য নয়। মাস্টারমশাইয়েরাও কৌতুক করে বলতেন, আসলে সুকুমার সেন ছাত্রদের জন্য লেখেন না; তিনি লেখেন মাস্টারমশাইদের জন্য। ঔপন্যাসিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহনা' গল্পরস সন্ধানী পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে না। 'উপন্যাস'কে যারা শুধু 'অবসর বিনোদনের সঙ্গী' বলে মনে করে থাকেন, তারা ধূর্জটিপ্রসাদবাবুর উপন্যাসের পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় বিরূপ মনোভাবই পোষণ করবেন। কেননা ধূর্জটিপ্রসাদবাবুর উপন্যাস পাঠের জন্য যে বোধ, যে মননশীলতা প্রয়োজন; গল্পরস-সন্ধানী বা যারা উপন্যাস পড়ে সময় কাটাতে চান, তাদের মধ্যে সেই বোধ ও মননশীলতা থাকে না। এ কারণেই বোধ হয় 'অন্তঃশীলা' প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে বলতে হয়েছিল, -'শুনেছি বাংলা উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাক্‌চল্লিশ ডেলি প্যাসেঞ্জার আর উত্তরচল্লিশ পৌরস্ত্রী' [৫] এবং 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসটি সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট অভিমত অন্তঃশীলা ঠিক শিশুপাঠ্য উপন্যাস নয়; বইখানি ভাবুকের জন্যে লেখা এবং ভাবুকের দ্বারা লিখিত'। [৬]

পাঠক-প্রতিক্রিয়া তত্ত্বটির বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পাঠক-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বটি বিভিন্ন পাঠকের পৃথক পৃথক ব্যাখ্যার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। কাজেই কোনো একটি টেক্সট সম্পর্কে পাঠকদের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য। সুতরাং, পাঠক-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি টেক্সটের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ উপসংহার টানা বা বিষয়টিকে সাধারণীকরণ করা কঠিন হয়ে যায়। তাছাড়া পাঠক-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বটি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে পাঠকের পাঠ ব্যাখ্যা ও ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার উপর জোর দেয়। এ ক্ষেত্রে কোনো একটি টেক্সটের বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা নান্দনিক দিকগুলি পাঠক উপেক্ষা করে যেতে পারেন। পাঠক যদি কোনো রচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় – যা কি না লেখক প্রকারান্তরে বলতে চেয়েছেন, যার অভ্যন্তরে রয়েছে বৃহত্তর কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, পাঠক যদি সেদিকে না গিয়ে ভিন্ন পথে গিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন, তাহলে মূল রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্যটিই ব্যহত হতে পারে। 'Reader-response Theory' নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন বা যাঁরা এই তত্ত্বের উদ্ভাবক হিসেবে পরিচিত, তাঁরা কেউই এই বিষয়গুলি ভেবে দেখেন নি।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, যেকোনো শ্রেণির পাঠকের পাঠ-প্রতিক্রিয়া থেকে সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধে রয়েছে। কোন্ গ্রন্থ কোন্ শ্রেণির পাঠক পাঠ করে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন, পাঠক-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বে এই বিষয়টিও ভাবনায় রাখা অত্যন্ত আবশ্যক বলেই মনে হয়। একথাও ঠিক যে, 'গঠনমূলক সমালোচনা' বা Formalistic Approach- কে সম্পূর্ণত অস্বীকার করে পাঠক-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বটি

বিস্তারলাভ করতে পারে না। সুপ্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সাহিত্যের এত শ্রেণি, এত রূপ, এত অবয়ব, এত শাখা-প্রশাখা জন্ম নিয়েছে যে, একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক করতে গেলে 'গঠনমূলক সমালোচনা'-কে গুরুত্ব দিতেই হবে। যতদিন নিত্য-নতুন শিল্প-সাহিত্যের জন্ম হবে-সমালোচকেরা সেই সব শিল্পকর্মের রূপ-অবয়ব নিয়ে আলোচনা করবেন। তবে, রূপ-অবয়বের আলোচনায় বা রস আস্বাদনের ক্ষেত্রে পাঠকের ভাবনাটিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো একটি গ্রন্থপাঠের জন্য পাঠকের eligibility থাকতে হবে। পরিশেষে বলা যায়, 'উপযুক্ত' পাঠকের 'উপযুক্ত' প্রতিক্রিয়াই শিল্প-সাহিত্যের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করতে পারে। সেই দিন হয়তো বা বেশি দূরে নেই, যেদিন 'গঠনমূলক সমালোচনা' বা Formalistic Approach-এর সঙ্গে পাঠক-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব বা 'Reader-response Theory'-কে মিলিয়ে মিশিয়ে নতুন এক সমালোচনা পদ্ধতি জন্ম নেবে।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের তাৎপর্য', আশ্বিন, ১৪১৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা - ১৭, পৃষ্ঠা-১৪৩।
২. https://en.wikipedia.org/wiki/Reception_theory
৩. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, 'উপন্যাসে জীবন ও শিল্প', দ্বিতীয় পরিবর্ধিত বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, বইমেলা, ২০০৮, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯ , পৃষ্ঠা- ১২১।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৩।
৫. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, জুলাই ২০১০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, পৃষ্ঠা- ২৮।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮৭।